DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.226

Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 71-72, 2022
July-Sept., Oct.-Dec. 2022

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2022-10-23
Published: 2022-12-21

বিদ‘আত থেকে দীনের সুরক্ষায় *সাদ্দ আয্-যারাঈ‘* এর প্রয়োগ একটি উসূলী বিশ্লেষণ

Applications of *Sadd Al-Dharai‘* (blocking the means) for protecting the *Dīn* from *Bid‘ah* (innovation in religious matters) An *Uṣūli* Analysis

Md. Ariful Islam*

Abstract

The protection and preservation of Dīn is the fundamental and ultimate objective of the Islāmic Sharī'ah. Two types of provision, i.e., practicable and exclusionary, have been in place to protect Dīn. Bid‘ah belongs to the second. To ensure the protection of Dīn the Prophet PBUH has strictly prohibited engaging in Bid‘ah. Sadd al-dharai‘ is recognized as the complementary evidence of the Sharī'ah in all the prominent schools of Islāmic law. The term Sadd al-dharai‘ means blocking all means of action, which are permissible, but it can lead to any forbidden action. The means of Bid‘ah also push Dīn towards serious harm and destruction. Therefore, it is imperative to stop all the means that lead to Bid‘ah. Considering Sadd al-dharai‘ the means of Bid‘ah also need to be excluded. In order to ensure the protection of Dīn, the salaf-e-sālihīn, Usulists and jurists have applied it. By adopting analytical and descriptive methods, the discussion revolves around three main issues. ***Firstly****: Introduction to Sadd al-dharai‘, its authenticity as one of the complementary evidences of usūl al-fiqh, classifications, terms of condition, importance and necessity of application of Sadd al-dharai‘ in protecting Dīn from Bid‘ah,* ***Secondly****: definition and the methods of identifying Bid‘ah,* ***Thirdly****: The application of Sadd al-dharai‘ in protecting Dīn from Bid‘ah, and its terms and impact.*

Keywords: Blocking the means (سد الذرائع), Bid‘ah (بدعة), Objectives of Sharī‘ah (مقاصد الشريعة), Protection of Dīn (حفظ الدين)

সারসংক্ষেপ

দীনের সংরক্ষণ ইসলামী শরী‘আহর মৌলিক ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। পালনীয় ও বর্জনীয় দু’ধরনের বিধানের মাধ্যমে দীন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিদ‘আত দ্বিতীয় প্রকার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বিদ‘আতে লিপ্ত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। প্রসিদ্ধ সকল মাযহাবেই শরী‘আহ’র বিধানের দলীল হিসেবে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ স্বীকৃত। পরিভাষায় সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ বলতে বুঝানো হয়, কাজের এমন সব মাধ্যম রুদ্ধ করা, যা মূলগতভাবে

* Md. Ariful Islam is a Lecturer, Department of Islamic Studies, Cox’s bazar Internatioinal University, Bangladesh. E-mail: hmarif.cu95@gmail.com

অনুমোদিত, কিন্তু তা কোনো নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে। বিদ‘আতের উপায় ও মাধ্যমগুলো দীনকে মারাত্মক ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই যে সকল উপায় ও মাধ্যম বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে তা রুদ্ধ করা অপরিহার্য। সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির বিবেচনায় বিদ‘আতের উপায় ও মাধ্যমগুলোও পরিত্যাজ্য। সালাফে সালিহীন, উসূলবিদগণ ও ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ দীনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ নীতির প্রয়োগ করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। ***প্রথমত:*** *সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর পরিচয়, ইসলামী শরী‘আহ’র দলীল হিসেবে এর প্রামাণিকতা, প্রকারভেদ, শর্তাবলি, বিদ‘আত থেকে দীনের সুরক্ষায় সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ প্রয়োগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।* ***দ্বিতীয়ত:*** *বিদ‘আতের পরিচয় ও চেনার উপায়।* ***তৃতীয়ত:*** *বিদ‘আত থেকে দীনের হিফাজতকল্পে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর প্রয়োগ, এর শর্তাবলি ও প্রভাব।*

মূলশব্দ: সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘, বিদ‘আত, মাকাসিদ আশ-শরী‘আহ, দীন সংরক্ষণ

ভূমিকা

এমন কতিপয় কাজ রয়েছে মূলগতভাবে শরী‘আহ’র দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়; বরং বৈধ, কিন্তু পরিণতির দিকে লক্ষ করে শরী‘আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, যদিও সম্পাদনকারী নিষিদ্ধ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে না। শরী‘আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে বা সরাসরি নিষিদ্ধ কাজের যরী’আহ বা মাধ্যম হতে পারে- এ আশঙ্কায় শরী‘আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিতকারী পথ বা মাধ্যমকেও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়, যাতে নিষিদ্ধ কাজটি সম্পাদিত না হয়। আর একেই বলা হয় সাদ্দ-আয্-যারাঈ‘ বা ‘অকল্যাণ কিংবা মন্দ কাজের পথ রচনাকারী অনুমোদিত ও বৈধ উপায়-উপকরণগুলো বন্ধকরণ’। ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ সকল মাযহাবেই সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ শরী‘আতের সম্পূরক (complementary) দলীল হিসেবে স্বীকৃত। উসূলুল ফিক্হের পরিভাষায় এই মূলনীতিটি ইসলামী আইনে প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। যেমন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, দুর্গবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে ক্ষতি এবং দুর্গতির কারণ হতে পারে– এমন প্রতিটি উপায়কে প্রতিরোধ করে। কারণ ফিক্হের একটি মূলনীতি হলো- الدفع أسهل من الرفع “ক্ষতি অপসারণ করার চেয়ে সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষতি থেকে বাঁচা সহজতর” (Al-Suyūṭī 1983, 138)।

বিদ‘আত দীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আল্লাহ তা‘আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণের মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মহানবীর যুগে যা দীন ছিল না বর্তমানেও তা দীনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ “যে কেউ আমাদের এ দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।” (Al-Bukhārī 2002,2697; Muslim 2003,1718)। বিদ‘আতের উপায় ও মাধ্যমগুলোও দীনের জন্য মারাত্মক হুমকি।

তাই যে সকল উপায় ও মাধ্যম বিদ'আতের দিকে ধাবিত করে তা রুদ্ধ করা অপরিহার্য এবং সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির অধীনে বিদ‘আতের উপায় ও মাধ্যমসমূহও বিদ'আতের মতই পরিত্যাজ্য হবে। কেননা যে কাজ নিষিদ্ধ কাজের যরী‘আহ বা মাধ্যম হয় সে কাজ নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দীনের হিফাজত শরী‘আতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিদ‘আত দীনের বিকৃতি সাধন করে। শরী‘আহর অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা। তাই মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহর দাবীও বিদ‘আত থেকে দীনকে হিফাজত করা। সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ সম্পূরক মূলনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহর এ উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়। অর্থাৎ অকল্যাণ ও নিষিদ্ধ কাজের পথ রুদ্ধ করা হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সাদ্দ্ আয্ যারাঈ‘-এর পরিচয়, প্রকারভেদ, প্রামাণিকতা, প্রয়োগের শর্তাবলি, বিদ‘আতের পরিচয়, বিদ‘আত থেকে দীনের সুরক্ষায় এ মূলনীতি প্রয়োগের শর্তাবলি এবং এর প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ (سد الذرائع) এর পরিচয়

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ (سد الذرائع) উসূলুল ফিকহের (ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতির) একটি পরিভাষা, যা দু’টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সাদ্দ’ (سد) শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং ক্রিয়ামূল হলে এর অর্থ হয়- বন্ধ করা, বাধা দেয়া, নিবারণ করা (Fazlur Rahman 2005, 558)। এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾

আমি তাদের সামনে ও পিছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি (Al-Qurān:36:09)।

যারাঈ‘ (الذرائع) শব্দটি ‘যরী‘আহ’ (ذريعة) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ মাধ্যম (Means, Medium), উসিলা (Pretense), পথ (expedient) ইত্যাদি (Al Ba‘albakī 1995, 562)। শাব্দিক অর্থে ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ের প্রতি পৌঁছার মাধ্যমকে যরী‘আহ বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণকর কাজে প্রলুব্ধকারী উপকরণ বুঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অতএব, সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ পরিভাষার শাব্দিক অর্থ উপায়-উপকরণ বা কোনো কাজের মাধ্যম বন্ধকরণ।

বিশিষ্ট উসূলবিদ আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী [মৃ. ৪৭৪ হি.] রাহ. বলেন,

هى المسألة التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور'

যে বিষয়ের বাহ্যিকটা বৈধ হলেও তা কোনো নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হয় তা-ই যারাঈ‘। (Al-Bājī 1996, 314)।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর সংজ্ঞা প্রদানে ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি:] রাহ. বলেন,

منع كل وسيلة مباحة قصد بها التوسل إلى مفسدة أولم يقصد إذا أفضت إليها غالبا وكانت مفسدتها أرجح من مصلحتها.

এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করা, যা দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই প্রাধান্য পায়। (Al-Jawziyyah 1423H, 4/553-554)।

অতএব বলা যায়, যেসব অনুমোদিত কাজ বা উপায়-উপকরণ শরী‘আত কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রতি ধাবিত করে, তার পথ রুদ্ধ করাই সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর প্রকারভেদ

যারাঈ‘ বা উপায়-উপকরণ বিভিন্নরূপ হতে পারে। যেমন-

ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহ. ফলাফলের ধরন বিবেচনায় যারাঈ‘ বা উপায়-উপকরণকে প্রথমত দুই প্রকার এবং দ্বিতীয় প্রকারকে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. যেসব মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ নিশ্চিতভাবে অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। যেমন-মূর্তিকে গালি দিলে মূর্তিপূজারীরা আল্লাহ তা‘আলাকে গালি দেবে- এটা জেনেও মূর্তিকে গালিগালাজ করা।

২. যেসব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ মূলগতভাবে বৈধ; কিন্তু তা দ্বারা যদি কোনো অকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন- এমন ব্যবসায়িক চুক্তি, যা দ্বারা সুদের ইচ্ছা করা হয়।

৩. যেসব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ মূলগতভাবে বৈধ; কিন্তু তা দ্বারা কোনো অকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য করা হয়নি বটে; কিন্তু অধিকাংশ সময় তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তদুপরি তাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের দিকটিই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যেমন- মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রয় করা।

৪. এমন কিছু বৈধ উপায়-উপকরণও রয়েছে, যা কোনো কোনো সময় হয়তো অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে; কিন্তু তাতে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের দিকটিই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যেমন- বাগদত্তার প্রতি দৃষ্টিদান করা, তাকে ভালোভাবে দেখা, বাকিতে বেচাকেনা করা (Ibn al-Qayyim 1423H, 4/554)।

এ প্রকারগুলোর বিধান সম্পর্কে ইব্‌নুল কাইয়্যিম রাহ. বলেন, শরী‘আত প্রথম প্রকারের উপায় নিষিদ্ধ করেছে এবং চতুর্থ প্রকারকে বৈধতা প্রদান করেছে; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বিধান কীরূপ হবে- তা পর্যালোচনার দাবি রাখে, শরী‘আত এগুলোকে অনুমোদন দিয়েছে নাকি নিষিদ্ধ করেছে ।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বিধান কীরূপ হবে– তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামের অভিমত হলো, ক্ষতি ও অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করার জন্য এরূপ বৈধ উপায়-উপকরণগুলোর চর্চা রুদ্ধ করা প্রয়োজন।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ এর প্রামাণিকতা

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক দলীল হিসেবে সকল ইমামের নিকট স্বীকৃত। কুরআন ও হাদীসে এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য

বিধান রয়েছে এবং সাহাবীগণও এ মূলনীতির ওপর নির্ভর করে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এর প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, হাদীস ও সাহাবীদের আমল থেকে ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ রাহ. ত্রিশটি ও ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহ. নিরান্নব্বইটি দলীল পেশ করেছেন। সেসব প্রমাণের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

প্রথমত: কুরআন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ ﴾

> আমি আদমকে বললাম, তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে থাকো, তবে এ গাছটির কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা দু‘জন যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (Al-Qurān, 2: 35)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আদম ও হাওয়াকে (আ.) বৃক্ষটির নিকবর্তী হতে নিষেধ করেছেন নিষিদ্ধ কাজের (ফল ভক্ষণ) উপলক্ষকে রুদ্ধ করার জন্য। যেহেতু নিকটবর্তী হওয়া বৃক্ষটির ফল ভক্ষণের দিকে ধাবিত করার সম্ভাবনা প্রবল, তাই উপলক্ষকেই নিষিদ্ধ করা হলো। আল্লামা শাওকানী [মৃ. ১২৫০ হি.] রাহ. বলেন, “নিকবর্তী হওয়ার নিষেধাজ্ঞা মূলত নিষিদ্ধ কাজের উপায়-উপকরণকেই রুদ্ধকরণ ও মূলোৎপাটন”(Al- Shawkānī 2007, 47)। ইব্ন আতিয়্যাহ [মৃ. ৫৪১ হি.] রাহ. এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “এটি সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর প্রামাণিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।” উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন (Ibn 'Aṭiyyiah ND, 76-77)। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে মূর্তিকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এর প্রতিউত্তরে মুশরিকরাও আল্লাহকে গালি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

সুন্নাহের ভাষ্যেও সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর নীতি গ্রহণের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। যেমন- ‘আয়িশা সিদ্দিকা রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে সময় তিনি বলেছিলেন, ইহুদি ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর লা’নত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। ‘আয়িশা সিদ্দিকা রা. বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে” (Al-Bukhārī 2002, 1330)। ইব্ন বাত্তাল [মৃ. ৪৪৯ হি.] রাহ. বলেন, “এ নিষেধাজ্ঞা শিরকের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ মূলোৎপাটন করার নীতি থেকেই গৃহীত। যাতে অজ্ঞরা তাঁর কবরকে পূজা না করে বসে, যেরূপ ইহুদি-খ্রিস্টানরা

তাদের নবীদের কবরকে পূজনীয় হিসেবে গ্রহণ করেছে” (Ibn Baṭṭāl 2003, 3/311)। অনুরূপভাবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরকের দ্বার রুদ্ধ করতে নিজের দাস-দাসীকে আমার দাস, আমার দাসী বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়ত : সাহাবী ও পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণ

সাহাবীগণের মধ্যে হারামের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিভিন্ন উপলক্ষ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ইজ্মা সংঘটিত হয়েছে। যেমন-

একদল মানুষ মিলে একজন মানুষকে হত্যা করলে কিসাস স্বরূপ উক্ত হত্যাকারী দলকে হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবীদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে অন্যায় হত্যার পথ রুদ্ধ করা যায়। অনুরূপভাবে উসমান রা. এর মুসলিম সাম্রাজের সর্বত্র একই পঠনরীতিতে লিপিবদ্ধ কুরআনের কপি প্রেরণের উপর সাহাবীগণের মতৈক্য হয়েছে। কারণ, একাধিক পঠনরীতি বিভক্তির পথ খুলে দেয়। সাহাবীগণ মুসলিম সমাজের মাঝে বিভক্তি ঠেকাতে একই পঠনরীতি অনুসরণের ওপর একমত পোষণ করেন (Al-Jawziyyah 1423H, 5/61, 65)।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি

ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মতে, সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ ফিক্হশাস্ত্রের অন্যতম মূলনীতি। সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ এর নীতির প্রতি গুরুত্বারোপ ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে এর অনুশীলনে চার মাযহাবের ইমামগণ প্রায় একমত। তবে ইসলামী শরী‘আহর দালীলিক মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমামগণ কিঞ্চিত মতপার্থক্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে চার মাযহাবের মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ক. **হানাফী মাযহাব:** হানাফী মাযহাবের কোনো ইমাম থেকে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ নীতি গ্রহণের পক্ষে কোনো উক্তি বর্ণিত হয়নি বা তাঁদের মাযহাবের কোনো গ্রন্থে এর আলোচনাও স্থান পায়নি, কিন্তু এ মাযহাবের বিভিন্ন ফিক্হী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয়, তাঁরা ফিক্হের বিভিন্ন গৌণ মাসআলায় এ নীতি প্রয়োগ করেছেন। তবে ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ.৭৯০ হি.] রাহ. দাবি করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] রাহ. সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ নীতি সমর্থন করতেন। তিনি বলেন, “ইমাম আবূ-হানীফা রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যারাঈ‘ বিষয়ক ইমাম মালিক রাহ.-এর নীতি সমর্থন করেন, যদিও এর বিস্তারিত বিশ্লেষণে কিছু বিষয়ে তিনি তাঁর বিরোধিতা করেছেন” (Al-Shāṭibī, 1997, 4/68)।

খ. **হাম্বলী মাযহাব:** মালিকী মাযহাবের মত হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরাও সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ কে সাধারণভাবে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ফিক্হের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত বেচা-কেনা অধ্যায়ে একে প্রয়োগ করেন। এ নীতি সম্পর্কে তাঁদের ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি বিদ্যমান। ইব্ন কুদামাহ [৫১৪-৬২০হি.] রাহ. বলেন, যারাঈ‘ বিবেচনাযোগ্য” (Ibn Qudāmah 1969, 4/132)। ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহ. বলেন, সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ দীনের এক চতুর্থাংশ” (Al-Jawziyyah 1423H, 5/66)।

গ. **মালিকী মাযহাব** : মালিকী মাযহাবের ইমামগণ এ মূলনীতিকে আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং অন্য যে কোনো মাযহাবের তুলনায় তারা এ মূলনীতি অধিক পরিমাণে অনুশীলন করেছেন। ইমাম আশ-শাতিবী রাহ. বলেন,

قاعدة الذرائع التى حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه

ইমাম মালিক রহ. ফিক্হের অধিকাংশ অধ্যায়ে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ'-মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন। (Al-Shāṭibī, 1997, 5/182)।

ঘ. **শাফি'ঈ মাযহাব** : ইমাম আশ-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] রাহ. রায়ভিত্তিক ইজতিহাদকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ না করার অভিমত পোষণ করেন। তাই তাঁর মাযহাবে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' ইজতিহাদের অংশ হওয়াতে একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য শাফি'ঈ মাযহাবের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' নীতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় (Al-'Anjī 2007, 57-60)।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' মূলনীতি প্রয়োগের শর্ত

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' শারী'আতের দলীল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, যে কোনো ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যাবে। কেননা এ নীতি অতিমাত্রায় প্রয়োগ করলে মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর ও দুঃসহ হয়ে উঠবে। আবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করলে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের প্রতি ধাবিত হবে। এ কারণে আলিমগণ এ নীতি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

১. যদি অনুমোদিত উপায়-উপকরণ অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, এ অকল্যাণের দিকে ধাবিত করাটা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। এমনকি যদি সৎ নিয়্যাতেও উক্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা হয় এবং তা অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, তবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

২. সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' যদি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি থাকলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে।

৩. উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে মাঝে মধ্যে, কোনো কোনো সময় অকল্যাণ সাধন করলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

৪. যদি উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে বা প্রবল ধারণায় অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পরিমাণ বিবেচনায় নিষিদ্ধ করা হবে। সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' কোনোক্রমেই শার'ঈ নাস্ (Text of Quran and Sunnah) বিরোধী হবে না (Amin 2013, 189-190)।

বিদ'আত থেকে দীনের সুরক্ষায় সাদ্দ্ আয্-যারাঈ' মূলনীতি প্রয়োগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দীন ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবন বিধান। মহান আল্লাহ সর্বশেষ রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে এর পরিপূর্ণতা দান করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত দিকনির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। দীনের

মধ্যে নতুনভাবে সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার এখতিয়ার কারো নেই এবং প্রয়োজনও নেই। দীনকে বিকৃতির কবল থেকে হিফাজত করা সকলের ওপর ফরয। দীনের সুরক্ষা ইসলামী শরী'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য।[১] এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইউবী বলেন, দীন সংরক্ষণ ইসলামী শরী'আহ'র মাকাসিদ-এর মধ্যে অন্যতম এবং অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মাকসাদ। এ গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদকে অবহেলা করা, নষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয়া, কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পাত্র বানানোর কোন সুযোগ নেই। দ্বীন তথা ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন, তথাপি এর সুরক্ষার জন্য তিনি কতিপয় বিধি-বিধান প্রদান করেছেন। দ্বীনের জন্য কাজ করা, দ্বীন রক্ষার্থে জিহাদ করা, দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহবান করা, দ্বীন অনুযায়ী জীবনকার্য পরিচালনা করা, সর্বোপরি দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক সব কিছু প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি (Al-Yoūbī 1998, 193-195)।

ইসলামী বিধি-বিধানের মাধ্যমে দু'ভাবে দীনের মাকসাদ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এক. আদেশসূচক বা পালনীয় বিধান আরোপ করার মাধ্যমে এবং দুই. নিষেধসূচক বা বর্জনীয় বিধান আরোপ করার মাধ্যমে, যা এর সুরক্ষায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। নিষেধসূচক কার্যাবলি সম্পাদন করলে দীনকে বিকৃত এবং ধ্বংস করা হয়, তাই নিষেধসূচক কার্যাবলি পরিহার করে দীনের সুরক্ষা করা অপরিহার্য। কুফর, শিরক নিফাক ও বিদ'আত ইত্যাদি দীনকে ধ্বংস করে দেয়। তাই দীনের সুরক্ষায় বিদ'আতকে প্রতিরোধ করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা আয্-যুহাইলী [জ. ১৯৪১ খ্রি.] বলেন, অনুরূপভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক নতুন বিধি-বিধান প্রণয়ন নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল প্রকারের বিকৃতি, ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে ধর্মের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। নেতিবাচক দিক থেকে ধর্মের সংরক্ষণ বলতে নিষেধাজ্ঞা, সতর্কবাণী ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে (Al- Zuḥailī ND, 319)। নিষেধসূচক কার্যাবলি পরিহার করার মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহর মাকসাদ তথা দীনের সুরক্ষা প্রসঙ্গে ড. ইউবী আরো বলেন, অপরদিকে যে বিষয়গুলো দীনের জন্য ক্ষতিকর, দীনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিকৃতির সহায়ক, সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকাও দীন সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ করার পর্যায়ভুক্ত (Al-Yoūbī 1998, 193-195)। বিদ'আত যেমনভাবে দীনকে বিকৃতি করে, তেমনি বিদ'আতের দিকে ধাবিতকারী উপায়-উপকরণও দীনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই বিদ'আতের উপলক্ষের

---

১. মাকাসিদ আশ্-শারী'আহ বলতে বুঝায় শারী'আত প্রণেতা কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহের ভাষ্যে প্রণীত বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত হবে (Monawer 2017, 58)। কল্যাণ ও গুরুত্বের বিচারে মাকাসিদ তিন প্রকার ক. জরুরিয়্যাত বা অত্যবশ্যকীয় মাকাসিদ, খ. হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনীয় মাকাসিদ ও গ. তাহসিনিয়্যাত বা সৌন্দর্যবর্ধক। জরুরিয়্যাত বা অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ পাঁচটি দীনের সুরক্ষা, জীবনের সুরক্ষা, বংশ মর্যাদার সুরক্ষা, বিবেক বুদ্ধির সুরক্ষা ও অর্থের সুরক্ষা।

চর্চা করার বিধানও তদ্রূপ অর্থাৎ তার চর্চা রুদ্ধ করা ও প্রতিরোধ করা জরুরি। আর এক্ষেত্রে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে দীনের হিফাজত তথা সংরক্ষণ করে। তাই বিদ‘আতের কবল থেকে দীনকে সংরক্ষণে ‘সাদ্দুয-যারাঈ‘ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইউবী বলেন,‘সাদ্দুয-যারাঈ‘ মূলত মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহ’র বাস্তবায়ন এবং তা সংরক্ষণ করে। বিভিন্ন উপায়-উপকরণ বাহ্যিকভাবে যদিও বৈধ মনে হয়, কিন্তু তা মানব জীবনে কল্যাণ দূরীকরণ এবং অকল্যাণের পথ সুগম করার মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহ’ ধ্বংসের সূচনা করে। তাই এ সকল বৈধ উপায় ও পদ্ধতি বন্ধ করার মাধ্যমে মূলত মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহ’র বাস্তবায়ন ও হিফাজত করা হয় (Al-Yoūbī 1998, 579-580)।

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ ও বিদ‘আত

বিদ‘আত দীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। তাই যে সকল উপায়-উপকরণ বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে তা রুদ্ধ করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহ. বলেন, “যেহেতু উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে কোনো মাকসাদ তথা চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় না, তাই সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণের বিধানও মূল মাকসাদের বিধানের অনুরূপ হবে। সুতরাং নিষিদ্ধ এবং পাপাচারের উপায়-উপকরণ তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের আলোকে হারাম কিংবা মাকরূহ হবে (Al-Jawziyyah 1423H, 3/135)। সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির অধীনে বিদ‘আতের উপায়-উপকরণও পরিত্যাজ্য হবে। নিম্নে বিদআতের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, বিদ‘আত চেনার উপায় ও এতদ্বসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিদ‘আতের পরিচয়

বিদ‘আত (بدعة) আরবি শব্দ। অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাতের বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিদ‘আতের আভিধানিক অর্থ হলো- পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে নতুনভাবে কোনো বস্তু বা বিষয় উদ্ভাবন করা (innovate)। যেমন ইমাম নববী [মৃ.৬৭৬হি.] রাহ. বলেন:

البدعة كل شيئ على غير مثال سابق.

> কোনো পূর্ব নমুনার অনুসরণ করা ছাড়াই যে কোনো সম্পাদিত আমলকেই বিদ‘আত বলা হয় (Qārī 2001, 1/337)।

পরিভাষায় বিদ‘আতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়–

البدعة هي: ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه أو بعبارة أوجز ما أحدث في الدين من غيردليل.

> বিদ‘আত হলো দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়, যার পক্ষে প্রমাণ বহন করে এমন কোনো সাধারণ কিংবা বিশেষ দলীল থাকে না। অথবা সংক্ষেপে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়- দলীল বিহীন দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদ‘আত (Al-Jīzānī 1998, 24)।

বিভিন্ন হাদীসে বিদ‘আতের উপর্যুক্ত শার‘ঈ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

> যে কেউ আমাদের এ দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে (Muslim 2006, 1718; Al-Bukhārī 2002, 2697)।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, শার‘ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আমল বিদ‘আত হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যাওয়া শর্ত। এগুলো হলো: ক. নব উদ্ভাবন, খ. নব উদ্ভাবন দীনের মধ্যে হওয়া। গ. এ নব উদ্ভাবনের পক্ষে কোনো শরয়ী ভিত্তি না থাকা, কোনোরূপ দলীল না থাকা।

উল্লেখ্য, কোনো আমল দীনের মধ্যে নব উদ্ভাবন হিসেবে গণ্য করার জন্য তিনটি মানদণ্ড রয়েছে। অর্থাৎ কোনো আমল তিনটি মানদণ্ডের কোনো একটির আওতাভুক্ত গণ্য হলে বিদ‘আতের বিধান আরোপ করা যায়।

প্রথম : শারী‘আতসিদ্ধ নয় এমন কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা করা।

দ্বিতীয় : দীনের বিধি-ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে যাওয়া।

তৃতীয় : উপরোক্ত দুটি মানদণ্ডের দিকে ধাবিত করে এমন উপায়-উপকরণ।

উল্লিখিত শর্তালোকে দীনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বস্তুগত ও বৈষয়িক আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ শার‘ঈ বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তেমনিভাবে নব উদ্ভাবিত নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজও বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হবে না; কিন্তু এমন গর্হিত বিষয় যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা নিয়ে পালন করা হয় কিংবা ধারণা করা হয় যে, এমন গর্হিত বিষয় দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিকে ধাবিত করবে; তাহলে তাও বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হবে (Al-Jīzānī 1998, 21)।

বিদ‘আত চেনার উপায় : বিদ‘আত চেনার নিম্নোক্ত মৌলিক তিনটি নীতিমালা রয়েছে।

ক. এমন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করা, যা শরী‘আহ কর্তৃক প্রণীত নয়। কেননা শরী‘আতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো- এমন আমল দ্বারা সাওয়াবের আশা করতে হবে, যা কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা নিজে কিংবা সহীহ হাদীসে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছেন। তাহলে কাজটি ইবাদত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজ অনুমোদন করেননি সে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা বিদ‘আত বলে গণ্য হবে।

খ. দীনের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে অন্য ব্যবস্থার অনুসরণ ও স্বীকৃতি প্রদান। ইসলামে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শরী‘আতের বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ও বিধানের মধ্যে থাকা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ইসলামী শরী‘আতের বিধান ব্যতীত অন্য বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করল ও তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করল সে বিদ‘আতে লিপ্ত হলো।

গ. যে সকল কর্মকাণ্ড সরাসরি বিদ‘আত না হলেও বিদ‘আতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদ‘আতে লিপ্ত করে, সেগুলোর হুকুম বিদ‘আতেরই অনুরূপ।

তৃতীয় মানদণ্ডের বিশ্লেষণ: যে সকল কর্মকাণ্ড মৌলিকভাবে বৈধ এবং সরাসরি বিদ‘আত না হলেও বিদ‘আতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদ‘আতে লিপ্ত করে, সেগুলোর হুকুম বিদ‘আতেরই অনুরূপ। সুতরাং আলিমগণ বিদ‘আতের উপায়-উপকরণের চর্চা রুদ্ধ করতে, সুন্নাতকে বিদ‘আত থেকে পৃথক করতে এবং দীনকে রক্ষা করতে এমন কর্মকাণ্ড বিদ‘আত না হলেও বর্জন করে চলতে হবে মর্মে ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে এমন উপায়-উপকরণের বিধান

এ মূলনীতির মর্মার্থ হলো- যে সকল বৈধ কাজ আল্লাহর দীনে নতুন নতুন বিধান আবিষ্কারের দিকে ধাবিত করে সেসকল কাজ বিদআত না হলেও বর্জনীয়। এ মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো– দীনকে বিদ‘আত থেকে রক্ষা করা। আর তা হাসিল হবে বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে–এমন উপায়-উপকরণকে নিষিদ্ধ ও রুদ্ধ করার মাধ্যমে। ইব্নুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) রাহ. বলেন,

> فإن ابتدع شيئ لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطى عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا بنفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الابتداع.
>
> শরী‘আত পরিপন্থী নয়- এ ধরনের নতুন কিছু উদ্ভাবন করা এবং তা যদি নিয়মিত পালনও করা না হয়; তথাপি অধিকাংশ সালাফে সালিহীন সুন্নাতের অনুসরণকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার উদ্দেশ্যে এগুলোকে খারাপ জানতেন এবং তাঁরা প্রত্যেক বিদ‘আতীকে ঘৃণা করতেন, যদিও কাজটি মূলগতভাবে জায়িয হত (Ibn al-Jawzī ND, 18, ‘Alī 2011, 1/67)।

এর দ্বারা জানা যায়, যেসব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ধাবিত করে তাও নিষিদ্ধ হবে; কেননা উদ্দেশ্য হাসিলের সামঞ্জস্যের কারণে মূলের বিধান উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ জন্য বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে– এমন উপায়-উপকরণ বিদ‘আতের মতই পরিত্যাজ্য। বিদ‘আতের বিধানই তার বিধান। কাজেই বিদ‘আতের মত এ সকল উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন ও অবলম্বন নিষিদ্ধ ও গোমরাহী। শরী‘আতের একটি মূলনীতি হলো- ينزل الشيئ منزلة ما يفضى إليه-"যে সকল কর্মকাণ্ড যে বিষয়ের দিকে ধাবিত করে সে সকল কর্মকাণ্ডকে সে বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত ধরা যায়।"

উপায়-উপকরণের তারতম্য এবং ধাবিতকরণের শক্তি অনুসারে এ পর্যায়ভুক্তকরণ বিভিন্ন রূপ হতে পারে। সুতরাং বিদ‘আত যদি বড় ও মারাত্মক পর্যায়ের হয় এবং তার দিকে ধাবিতকারী উপায়ও শক্তিশালী হয়, তাহলে উপায়-উপকরণের বিধানও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারামের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণটি বর্জন করে চলতে হবে। আর বিদ‘আত যদি ছোট হয় এবং ধাবিতকারী উপায়ও দুর্বল হয়, তাহলে উপায়-উপকরণের বিধানও হালকা তথা ছোট গুনাহের পর্যায়ের হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণটি অপছন্দনীয় বা মাকরূহ হিসেবে গণ্য হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, উপায়-উপকরণকে বিদ‘আতের মতই পরিত্যাজ্য হিসেবে সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে এবং ইসলামী শরী‘আতের

বিধি-বিধানকে নব উদ্ভাবনের ফেতনা এবং বিকৃতকরণ থেকে রক্ষা করতে উপায়-উপকরণকে গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে এটাই শরী‘আহর লক্ষ্য এবং এতেই ইহ্তিয়াত তথা সাবধানতা অবলম্বন করা যায়। তবে শুধুমাত্র বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী হওয়ার কারণে কোনো কাজকে পরিত্যাজ্য হিসেবে স্থির করার জন্য আরো সুস্পষ্ট বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই কোনো কাজ বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে কিনা এবং তা কোন পর্যায়ের–এটা পর্যালোচনা করে কোনো কাজকে বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী উপায়-উপকরণ হিসেবে পরিত্যাজ্যরূপে স্থির করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে (Al-Jīzānī 1998, 18-20)।

কোনো কাজকে বিদ‘আতের যরী‘আহ বা উপায়-উপকরণ হিসেবে গণ্য করার শর্তাবলি

কোনো কাজকে বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী যরী‘আহ বা উপায়-উপকরণ হিসেবে গণ্য করে উক্ত কাজকে পরিত্যাজ্যরূপে স্থির করার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্ত: কাজটি বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: বিদ‘আতের দিকে উক্ত কাজের ধাবিতকরণ অকাট্যভাবে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: উক্ত যরী‘আহ বা উপায়-উপকরণকে বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী গণ্য করে এর চর্চা রুদ্ধও নিষিদ্ধ করার বিধান আরোপ করলে বিদ‘আতের চেয়ে আরো মারাত্মক কোনো বিভ্রান্তি, ক্ষতি বা অনিষ্টের প্রকাশ না হওয়া।

শর্তগুলোর বিশ্লেষণ

প্রথম শর্ত: কোনো কাজ বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী হওয়া।

নিম্নোক্ত তিনটি শর্তের কোনো একটি শর্ত পাওয়া গেলে কোনো কাজ বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে এবং বিদ‘আতের যরী‘আহ বা উপায়-উপকরণে পরিণত হয়।

ক. কোনো আমলের প্রচলন, বিশেষত অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে ঘটলে এবং উক্ত আমল মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করলে বিদ‘আতে পরিণত হয়। যেমন, মসজিদে জামাতবদ্ধ হয়ে নফল সালাত কায়েম করা।

খ. উক্ত আমল ধারাবাহিকভাবে পরিপালন ও আঁকড়ে ধরা। যেমন, জুমু‘আর দিন ফজরের সালাতে নিয়মিত সূরা আস্ সজদাহ তিলাওয়াত করা।

গ. উক্ত আমলের ফযীলতের দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে স্বেচ্ছায় ও পরিকল্পনা করে উক্ত আমল গুরুত্বের সাথে পালন করা (Al-Jīzānī 1998, 50)।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল [১৬৪-২৪১ হি.] রাহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, কিছু লোক সমবেত হয়ে এক সাথে হাত উঠিয়ে দুআ করলে এ পদ্ধতি আপনি অপছন্দ করেন কিনা? তিনি জবাবে বললেন, "আমি এ পদ্ধতি ভাইদের জন্য অপছন্দ করি না, যদি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পনা করে সমবেত না হয়। তবে বেশি বেশি এমন করলে তা আমি অপছন্দ করি।" ইসহাক ইবনু রাইওয়াই [১৬১-২৩৮ হি.] রাহ. ইমাম

আহমদ ইব্‌নু হাম্বলের উক্তি إلا أن يكثروا "তবে বেশি বেশি এমন করলে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ: যদি এমনভাবে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করে এ আমল করা হয়, যদ্দরুন বলা যায় যে, এ আমলটি বেশি বেশি পালন করা হচ্ছে" (Ibn Taimiyyah ND, 2/634)। অর্থাৎ যখন বেশি বেশি এমন আমল করা হয় তখন আমলটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করা হয়েছে মর্মে গণ্য করা হয়। আর তখনই তা বিদ‘আতে পরিণত হয়।

ইমাম শাতিবী রাহ.বলেন, "মোদ্দাকথা হলো, যে সকল আমলের শার‘ঈ কোনো ভিত্তি রয়েছে; কিন্তু এরূপ আমলের প্রচলন ঘটলে এবং তা নিয়মিত পরিপালন করা হলে সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকিদা পোষণ করার আশঙ্কা তৈরি হয়, সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ বা নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিতকারী উপায়-উপকরণকে রুদ্ধ করার মূলনীতি অবলম্বন করে এরূপ আমল মোটামুটি ত্যাগ করাই উত্তম এবং শরী‘আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য" (Al-Shāṭibī 1997, 2/32)।

দ্বিতীয় শর্ত: বিদ‘আতের দিকে উক্ত কাজের ধাবিতকরণ অকাট্যভাবে বা অধিকংশ ক্ষেত্রে হওয়া।

যদি সংশ্লিষ্ট আমল সাধারণত বিদ‘আতের দিকে কদাচিৎ ধাবিত করে, তাহলে এরূপ অবস্থায় তা পরিত্যাজ্য কাজ হিসেবে গণ্য হবে না; কেননা কোনো বিষয় কদাচিৎ ঘটলে তা বিবেচিত হয় না। যেহেতু শার‘ঈ বিধানের মূলনীতি স্থির করা হয়, যা অধিক ও প্রায়ই ঘটে– এমন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে (Al-Jawziyyah 1423H, 4/553-554)।

যেমন, হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)-কে স্পর্শ ও চুম্বন করা শরী‘আত সিদ্ধ একটি কাজ, বিদ‘আত নয়; যদিও কারো কারো মতে– এ আমল কখনো বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করতে পারে। তাদের যুক্তি হলো, যেহেতু এ পাথরটি চুম্বন করলে এ আকীদা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা জাগে যে, এটি কোনো রকম লাভ-ক্ষতি করতে পারে বা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কিছুকে ডাকার মত শিরকের সাদৃশ্য হয়। কিন্তু আমরা বলবো, এ আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া বা এরূপ আকীদার দিকে ধাবিত করার বিষয়টি একেবারেই অনিশ্চিত। তাই এরূপ বিষয়ের প্রতি না তাকিয়ে কালো পাথরটিকে চুম্বন করা বিদ‘আত তো হবেই না; বরং হাদীসের নির্দেশনানুযায়ী উত্তম কাজ ও সুন্নাত। যুবাইর ইব্‌নু আরাবী রাহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله
>
> এক ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ইব্‌নু উমার রা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি (Al-Bukhārī 2002,1611)।

তেমনিভাবে মসজিদে নববীতে অবস্থিত মুসহাফের নিকটবর্তী স্তম্ভ[২] তালাশ করে তার নিকটে সালাত আদায় করা মুহাম্মদ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাহ। হাদীসে

২. উস্তওয়ানা আয়িশা বা আয়িশা-স্তম্ভ নামে পরিচিত, এই স্তম্ভটি উস্তওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতর।

এসেছে, মুহাম্মদ ﷺ স্তম্ভ তালাশ করে তার নিকটে সালাত আদায় করতেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ ‘উবায়দ রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সালামা ইব্‌নুল আকওয়া রা. এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর সেই স্তম্ভের কাছে সালাত আদায় করতেন, যা ছিল মুসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম: হে আবূ মুসলিম, আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কী?) তিনি বললেন,

> فإنى رأيت النبي ﷺ يتحرى الصلاة عندها
>
> আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেখেছি (Al-Bukhārī 2002, 502)।

সারকথা, বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করলেই যে কোনো উপায়-উপকরণ বিদ‘আতে পরিণত হয়ে যায় না; বরং দেখতে হবে ধাবিতকরণ কতটুকু শক্তিশালী– অকাট্যভাবে বা প্রায়ই বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে কিনা? যদি অকাট্যভাবে বা প্রায়ই বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করে, তাহলে এরূপ উপায়-উপকরণকে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘-এর মূলনীতির ভিত্তিতে বিদ‘আতের মতই পরিত্যাজ্য গণ্য করা হবে।

তৃতীয় শর্ত: উক্ত যরী‘আহ বা উপায়-উপকরণকে বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী গণ্য করে এর চর্চা রুদ্ধ ও নিষিদ্ধ করার বিধান আরোপ করলে বিদ‘আতের চেয়ে আরো মারাত্মক কোনো বিভ্রান্তি, ক্ষতি বা অনিষ্টের প্রকাশ না হওয়া।

যদি বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী উপায়-উপকরণের চর্চা রুদ্ধ করলে পরিণতিতে এর চেয়ে মারাত্মক কোনো ক্ষতি বা অনিষ্টের প্রকাশ ঘটে, তাহলে এ অবস্থায় দু’টি ক্ষতির মধ্যে তুলনা করে যেটি হালকা এবং ছোট বলে প্রতীয়মান হবে, প্রয়োজনে তা মেনে নিয়ে বড় ক্ষতিকে অপসারণ করা হবে। এ অবস্থায় বিদ‘আতে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে বড় বা মারাত্মক ক্ষতি অপসারণ করা যায়, যেহেতু এরূপ অবস্থায় তুলনামূলকভাবে বিদ‘আতই ছোট এবং কম ক্ষতিকর। যেমন, ইমাম আহমদ ইব্‌নু হাম্বল রাহ.-এর কাছে কতিপয় শাসকের কুরআনের সাজসজ্জার জন্য হাজার দিনার ব্যয় করার আমল সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চাওয়া হয়। তিনি জবাবে বলেন, ‘তাদেরকে এ কাজ করতে দাও; কেননা তারা যে সকল কাজে স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করছে তার চেয়ে এ খাতে ব্যয় করা উত্তম।’ ইব্‌নু তাইমিয়াহ রাহ. এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন,

> অথচ ইমাম আহমদ ইব্‌নু হাম্বলের মত হলো কুরআনের মুসহাফ সজ্জিত করা মাকরূহ। কেউ কেউ তাঁর এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, তিনি মূলত কুরআনে কারীমের পাতা ও হস্তলিপির উন্নয়ন সাধন করতে অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে অবকাশ দেয়ার কথা বুঝিয়েছেন। আসলে তাঁর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয়, বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, এতে এক ধরনের কল্যাণ রয়েছে আবার ক্ষতিও আছে; যার কারণে এ কাজ মাকরূহ। কল্যাণ ও অকল্যাণের স্বরূপের ব্যাখ্যায় ইব্ন তাইমিয়াহ রহ. বলেন, তারা এ কাজে (কুরআনের সাজসজ্জার জন্য) অর্থ ব্যয় (অপচয়) না করলে তো ভালো, কিন্তু তারা যদি কুরআনের (সাজসজ্জার) জন্য এ ব্যয় না করে

> এর স্থানে অন্য কোনো (অধিকতর) অমঙ্গলজনক খাত যেমন-অশ্লীল বা গর্হিত ভাষা ও মর্মার্থ সম্বলিত গ্রন্থের- উদাহরণস্বরূপ গল্প গ্রন্থ, কবিতা গ্রন্থ, রোম, পারস্যের হেকমাত সম্বলিত গ্রন্থের জন্য ব্যয় করে, যাতে কোনো কল্যাণ নেই, তাহলে আপেক্ষিক অর্থে কম ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত না হয়ে বেশি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হতে হলো; অথচ কুরআনের জন্য তাদেরকে এ ব্যয়ের সুযোগ দিলে অনর্থক ও অন্যায়ের পথে ব্যয়কে বাধাগ্রস্ত করা যেত (Ibn Taimiyyah ND, 2/621-622)।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে দু’টি ক্ষতির মধ্যে হালকা ক্ষতি গ্রহণ করে বড় ক্ষতিকে অপসারণ করতে হবে। কাজেই উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে বিদ‘আতের উপকরণের চেয়ে আরো মারাত্মক ক্ষতিকে অপসারণ করতে ছোট বিদ‘আত বা উপকরণে লিপ্ত হওয়া দুষণীয় নয়। যখন এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখন এ মূলনীতি প্রযোজ্য হবে। নতুবা বিদ‘আতের উপকরণ বিদ‘আতের মতই পরিত্যাজ্য।

তবে বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী কোনো কাজকে নিষিদ্ধ করার জন্য সেই কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির বিদ‘আতের সংকল্প থাকতে হবে– এরূপ কোনো শর্ত নেই।

বিদ‘আত নির্মূলের ক্ষেত্রে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির অধীনে কয়েকটি উপ-মূলনীতি

যে কোনো কাজ বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করলে উপায়-উপকরণগত দিক বিবেচনায় তা বিদ‘আতে পরিণত হতে পারে। পাঁচটি শাখা মূলনীতির আওতায় এর বিশ্লেষণ করা হলো।

বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী উপায়-উপকরণ নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত (Al-Jīzānī 1998, 159-160)।

ক. বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী উপায়-উপকরণ হয়ত শরী‘আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কাঙ্ক্ষিত সুন্নাত বা মুস্তাহাব আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ. সাধারণ বৈধ আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন মুবাহ বা মাকরুহ (মাকরুহে তানযীহ)।

গ. (তৃতীয় ও চতুর্থ হলো) মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং নিষিদ্ধ আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ. বিদ‘আতের উপায়-উপকরণের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম শ্রেণি হলো, বিদ‘আতের পরিপূরক, যা বিদ‘আতের ওপর ভিত্তিশীল অনুষঙ্গ।

প্রথম উপ-মূলনীতি: যখন শরী‘আত প্রণেতার পক্ষ থেকে অনুমোদিত কোনো আমল এমনভাবে পরিপালন করা হয় যে তাতে এমন ধারণা জন্মে যে, উক্ত আমল শরী‘আত প্রদত্ত সঠিক রূপরেখা ও শরী‘আত প্রদর্শিত পন্থা-পদ্ধতির বিপরীত, তখন এরূপ আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যে যারাঈ‘ শরী‘আহ প্রণেতার পক্ষ থেকে কাঙ্ক্ষিত সুন্নাত বা মুস্তাহাব জাতীয় আমলের অন্তর্ভুক্ত হয় এ মূলনীতি তার সাথে নির্দিষ্ট। এর নিম্নোক্ত পাঁচটি রূপ হতে পারে।

প্রথম রূপ

সাধারণ শর্তহীন নফল আমল এমন পদ্ধতিতে পালন করা যে তা শর্তযুক্ত নফল বা হাদীসে বর্ণিত বিশেষ সুন্নাত (সুন্নাতে রাতেবা) হওয়ার ধারণা তৈরি হয়। যেমন, মসজিদে জামাতবদ্ধ হয়ে নফল সালাত কায়েম করা (Al-Turtūshī 1990, 66)।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আশ-শাতিবী রাহ. তাঁর *ই‘তিসাম* গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, নফল সালাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ নির্দেশনা হলো, গোপনে ঘরে আদায় করা। তিনি বলেন,

أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة.

> তোমাদের সর্বোত্তম সালাত হলো, যে সালাত তোমরা গৃহে আদায় করো, তবে ফরয সালাত নয়। (অর্থাৎ নফল সালাত গৃহে আদায় করা উত্তম; তবে ফরয সালাত মসজিদে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করাই কাম্য।) (Al Bukhārī 1422H, 731)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র ফরয সালাত প্রকাশ্যে আদায় করতে বলেছেন। এমনকি সর্বোত্তম মসজিদ– মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী বা মসজিদে আকসা হলেও নফল সালাত তাতে আদায় না করে ঘরে গোপনীয়তা বজায় রেখে আদায় করা উত্তম। এরপর তিনি আরো বলেন, আলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা করে বলেন, এ তিনটি মসজিদের কোনো একটিতে নফল সালাত আদায়ের চেয়ে ঘরে আদায় করা উত্তম। অনুরূপভাবে ফরয সালাতের মত জুম‘আর সালাত, রমযানে সালাতুল বিতর ও তারাবীহ এবং কতিপয় সুন্নাহও যেমন-দুই ঈদের সালাত, ইস্তিস্কা, সূর্যগ্রহণের সালাত প্রকাশ্যে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। এ কারণে বাকি সকল ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে আমল করাই শ্রেয়। সালাফে সালিহীনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে যথাসম্ভব ব্যক্তিগত আমল পরিপালনে গোপনীয়তা বজায় রাখার ওপর অটল ছিলেন। কারণ এক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও সর্বদা নফল সালাত ঘরেই আদায় করেছেন। এছাড়া সারা জীবনে দু’একটি ঘটনা ব্যতীত তিনি নফল সালাত জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করেননি। ঘরেও জামাত করেননি। শুধু একবার প্রথম পর্যায়ে ইবনু আব্বাস রা. ঘটনাচক্রে তাহাজ্জুদের সালাতে মহানবী ﷺ-এর ইকতিদা করেন, যখন তিনি তার খালা উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রা. এর গৃহে রাত কাটান। সুতরাং নফল সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার মতো সর্বদা কিংবা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টরূপে সমবেত হয়ে আদায় করা হয় এবং ফরয সালাত আদায়ের স্থান মসজিদ কিংবা সুন্নাতে রাতেবা (হাদীসে বর্ণিত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) আদায়ের স্থানে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করা হয় তাহলে এ কাজ বিদ‘আত হবে। কারণ এরূপ জামাতবদ্ধ হয়ে নফল সালাত আদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা কিরাম ও সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়। এরপর তিনি এ ক্ষেত্রে বিদ‘আতের অনুপ্রবেশের কারণ বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল নফল আমল প্রকাশ্যে জামাতবদ্ধ হয়ে নিয়মিত পালন করেছেন তা সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত। আর যে সকল নফল আমল এরূপ নয় (অর্থাৎ যা নিয়মিত, প্রকাশ্যে ও জামাতসহকারে আদায়

করা হয় না) তা সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত নয়; বরং তা হলো- সাধারণ নফল, যা গোপনীয়তা বজায় রেখে এবং জামাত ব্যতীত একাকী আদায় করা উচিৎ। কাজেই সুন্নাত নয়– এরূপ নফল আমল সুন্নাত আমল পরিপালনের মতো করে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আদায়ের মাধ্যমে নফলের শরী‘আহ প্রদত্ত প্রকৃতি, তার বিশেষ কাঠামো ও স্বকীয়তা নষ্ট করা হয়। আর এতে করেই অজ্ঞ ও সাধারণ মুসলিমরা যা সুন্নাত নয় তা সুন্নাতরূপে ধারণা করে নিবে। এতেই বড় বিভ্রান্তি ও বিপত্তি ঘটে। কেননা যা সুন্নাত নয় তা সুন্নাত জ্ঞান করা এবং সুন্নাতরূপে পরিপালন করা শরী‘আতকে বিকৃত করার নামান্তর। অনুরূপভাবে যা ফরয তা ফরযের বিশ্বাস না রাখা কিংবা যা ফরয নয় তা ফরয মনে করা ও তদ্রূপ বিশ্বাস মতে আমল করা গোমরাহী (Al-Shāṭibī ND, 1/344-346)।

ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহ.ও প্রায় অনুরূপ বলেছেন, নফল সালাত একাকী ও জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করা বৈধ, যদি না তা সাধারণভাবে জামাতসহকারে আদায় করা হয় এবং বারবার আদায় করা হয়। কারণ নফল সালাত নিয়মিত বা বারবার জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করলে শরী‘আহ নির্দেশিত ফরয সালাত, জুমুআ‘র সালাত ও ঈদের সালাতের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, এরূপ আমল অভ্যাসে পরিণত করা হলে এবং নিয়মিত গুরুত্বের সাথে আদায় করলে বিদ‘আতে পরিণত হয় (Ibn Taimiyyah ND, 2/648)।

দ্বিতীয় রূপ

সুন্নাত আমল ফরয আমলের মত করেই পরিপালন করা। যেমন, জুমার দিনের ফজরের সালাতে সূরা আস সাজদাহ ও সূরা আদ দাহ্‌র নিয়মিত তিলাওয়াত করা এবং অন্য কোনো সূরা তিলাওয়াত না করা। ফরযের মত এরূপ নিয়মিতকরণ বিদ‘আত। কারণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্নাতকে ফরযের মতো পরিপালন করা বিদ‘আত। ইমাম আবূ-শামা [মৃ.৬৬৫ হি.] রাহ. বলেন, নিয়মিত এরূপ করলে বিদ‘আতে পরিণত হবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا﴾

> রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে অনর্থকরূপে গ্রহণ করেছে (Al-Qurān: 25: 30)।

ইবনু আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কুরআনের কোনো কিছুই অনর্থক বা অসার নয় এবং এ কুরআন হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী, কুরআন এর মধ্যকার কোনো অংশ অপর কোনো অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে আলোচনায় বা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তাই কোনো অংশকে কোনো সালাতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া প্রকারান্তরে অপর অংশকে অনর্থকরূপে গ্রহণ না করার নামান্তর। তবে নিয়মিত তিলাওয়াত করা না হলে মুস্তাহাব আমল মুস্তাহাবই হবে, বিদ‘আতে পরিণত হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফজরের সালাতে এ দু’টি সূরা তিলাওয়াত করেছেন। তবে উনার এ আমলের দ্বারা এ দু’টিই তিলাওয়াত

করতে হবে– এমন বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয় না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [মৃ.২৪১ হি.] রাহ বলেন, "আমি জুমার দিন ফজরের সালাতে এ দু’টি সূরা নিয়মিত তিলাওয়াত পছন্দ করি না, যাতে লোকেরা এ সালাতটি সূরা আস সাজদাহ ও সূরা আদ দাহ্‌র এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট জ্ঞান না করে (Abū Shāmah 1981, 51)।

তৃতীয় রূপ

সাধারণ ইবাদত বিশেষ শর্তযুক্ত করে পরিপালন করা। যেমন সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয়–এমন ইবাদত কোনো সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করে পরিপালন করা, অনুরূপভাবে স্থানের সাথে শর্তযুক্ত নয়–এমন ইবাদত কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করে নেয়া, বিশেষ কোনো পদ্ধতি বা প্রকৃতির সাথে নির্দিষ্ট নয়–এমন ইবাদতকে কোনো পদ্ধতি বা প্রকৃতির সাথে নির্দিষ্ট করে নেয়া।

এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহ. বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ কোনো আমল অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিধানের প্রকৃতি ‘আম্ (ব্যাপক)[৩] এবং মুতলাক (শর্তমুক্ত)[৪] রাখলে তা খাস (নির্দিষ্ট)[৫] এবং মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত)[৬] করা সঙ্গত নয়। এরপর তিনি এর বিবরণ এভাবে দেন যে, উক্ত মূলনীতির আওতাধীন নজির বা দৃষ্টান্তসমূহ একত্রিত করলে কোনটি বিদ‘আত বা এ জাতীয় ইবাদতগুলোর কোনটি শরী‘আত সিদ্ধ তা নির্ণয় করা যায় (Al-Jīzānī 1998, 159-160)। যেমন, সাধারণত বছরে যে কোনো দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব ইবাদত, শরী‘আত নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করেনি এবং এর কোনো সময়-সীমাও নির্দিষ্ট নেই। শুধু বিশেষভাবে ঈদের দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। তবে এর মধ্যে বিশেষভাবে কতিপয় দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাবও, যেমন আশুরার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। সুতরাং কেউ শরী‘আতের নির্দেশনার বাইরে যেয়ে সপ্তাহের কোনো দিন অথবা মাসের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এরূপ নির্দিষ্টকরণ

---

৩. ‘আম্ শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী, সাধারণ, সর্বজনীন ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। এটি খাস বা নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত শব্দের বিপরীত। উসূলুল ফিক্‌হের পরিভাষায় আম ঐ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দকে বলে যা একই হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক একককে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে (Mulla Jīwan ND. 1/187)।

৪. আভিধানিকভাবে মুত্‌লাক্ব শব্দটি শর্তহীন ও সাধারণ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। পরিভাষায় বলা হয় المطلق الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها। অর্থাৎ এমন শব্দকে مطلق বলা হয়, যা শুধুমাত্র মূল বস্তুকেই বুঝায়, আর তার সাথে কোনো গুণের সামান্যতম সম্পর্ক থাকে না বা مطلق এর মধ্যে গুণের বা ত্রুটির প্রতি কোনোরূপ লক্ষ্য করা হয় না (Al-Sulamī 2005, 367)।

৫. ‘খাস’ (خاص) আভিধানিকভাবে শব্দটি নিদির্ষ্ট, সুনির্ধারিত, স্থিরকৃত, ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। পরিভাষায় মানার গ্রন্থকারের ভাষায় اما الخاص فكل لفظ وضع معنى معلوم على الانفراد অর্থাৎ খাস এমন প্রত্যেক শব্দকে বলে, যাকে স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে (Mulla Jīwan ND. 1/37)।

৬. মুকাইয়্যাদ (مقيد) শব্দটি مطلق -এর বিপরীত। মুকাইয়্যাদ এমন শব্দকে বলা হয়, যা কোনো বস্তুকে তার মূলের সাথে গুণাগুণসহ বুঝায়, বা যার মধ্যে গুণের পূর্ণতা বা ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করা হয় (Al-Sulamī 2005, 367)।

দলীলবিহীন নিজস্ব মত বৈ কিছুই নয়, আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ নির্দিষ্টকরণ শরী‘আত প্রণেতার নির্দিষ্টকরণের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা বিদ‘আতরূপেই গণ্য হবে। কেননা এরূপ নির্দিষ্টকরণ কোনোরূপ দলীল ছাড়াই শরী‘আতের বিধান প্রবর্তন করার নামান্তর; যা করার মানুষের কোনো অধিকার নেই।

অনুরূপভাবে ফযীলতপূর্ণ দিনগুলোকে বিভিন্ন রকমের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা; অথচ শরী‘আত এরূপ নির্দিষ্ট করেনি। যেমন, অমুক দিন এত রাকাত সালাত আদায় করা, এত পরিমাণ সাদকা কিংবা অমুক রাতে এত রাকাত সালাত আদায় করা বা অমুক রাতে কুরআন খত্ম করা ইত্যাদি আমল নির্দিষ্ট করে নেয়া বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। (Al-Shāṭibī ND 2/11-12)।

অতএব, শরী‘আত প্রণেতা যে বিধানকে মুত্লাক্ব (শর্তহীন ব্যাপকার্থবোধক) ও ‘আম্ (সাধারণ ব্যাপকার্থবোধক) রূপে প্রণয়ন করেছেন, সেই বিধানকে পরিপালনের ক্ষেত্রে মুত্লাক (শর্তহীন ব্যাপকার্থবোধক) ও ‘আম (সাধারণ ব্যাপকার্থবোধক) স্থির রেখে শরী‘আতের যর্থাথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। কেননা কেউ কোনো মুত্লাক্ব (সময় বা স্থান শর্তহীন) ইবাদতকে বিশেষ সময় বা বিশেষ স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করে নিলে, সে প্রকারান্তরে শরী‘আতের শর্তমুক্ত বিষয়কে শর্তযুক্ত করে নিল।

ইব্ন তাইমিয়াহ রাহ. উক্ত বিশেষত্ব ও নির্দিষ্টকরণের অসঙ্গতি ও অকল্যাণ তুলে ধরে বলেছেন,

> যে কেউ কোনো বিশেষ দিবসের আমল উদ্ভাবন করবে, যেমন-কেউ রজব মাসের প্রথম পাঁচ দিন সাওম পালনের আমল উদ্ভাবন করল। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার অন্তরে এ আমলের কোনো বিশেষত্বের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। কারণ, যখন সে এমন আমল প্রবর্তন করল, অবশ্যই সে তার প্রবর্তিত আমলের বিশেষত্বও জানে এবং বিশ্বাস পোষণ করে উক্ত আমলের প্রবর্তন করেছে। যেমন হয়ত তার বিশ্বাস মতে উপরিউক্ত রজবের প্রথম পাঁচদিন অন্য যে কোনো দিবসের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ এবং এ দিবসগুলোতে রোযা রাখাও মুস্তাহাব। অন্য যে কোনো পূববর্তী বা পরবর্তী পাঁচদিন অপেক্ষা এ পাঁচদিন ফযীলতপূর্ণ। কেননা সে এ বিশ্বাস পোষণ না করলে এ দিন-রাতগুলোকে এ আমলের জন্য বাছাই করত না। বলা বাহুল্য, অগ্রাধিকার প্রদানের কোনো কারণ ছাড়া কেউ কখনো কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দেয় না। (Ibn Taimiyyah ND, 2/603-604)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিশেষায়িতকরণ ও নির্দিষ্টকরণে কোনো অসঙ্গতি বা অকল্যাণ না থাকলে এরূপ নির্দিষ্টকরণে কোনো ক্ষতি নেই। অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা কোনো যৌক্তিক কারণে অনুরূপ কোনো দিবস নির্দিষ্ট করলে এবং তাতে কোনো অসঙ্গতি না থাকলে অসুবিধা নেই। যেমন কেউ বৃহস্পতিবারকে সালাতুল ইস্তিস্কার জন্য এ যুক্তিতে নির্দিষ্ট করল যে, বৃহস্পতিবার লোকেরা কাজকর্ম থেকে অবসর থাকে, তাই জড়ো হওয়ার জন্য সময়-সুযোগ পাবে। তাহলে এরূপ নির্দিষ্টকরণ শরী’আহর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর যদি আলোচ্য নির্দিষ্টকরণ শরী‘আত সিদ্ধ নয়– এমন কোনো আমল শারী’আত সিদ্ধ হওয়ার

আকিদা তৈরি হওয়ার যরী’আহ বা উপলক্ষ হয় তাহলে এরূপ নির্দিষ্টকরণ দু’টি কারণে নিষিদ্ধ। প্রথমত, শরী’আহ পরিপন্থী আমলের যরী’আহ বা উপায়-উপকরণ হওয়ার কারণে। দ্বিতীয়ত, এরূপ নির্দিষ্টকরণ শরী‘আতের সংশ্লিষ্ট আমলের প্রকৃতি তথা ব্যাপকতা বিরোধী।

ইমাম আশ্-শাতিবী রাহ. বলেন, কোনো আমল ও তা পরিপালনের প্রকৃতি তথা ব্যাপকতা উপলব্ধি করার পর আরো একটি মূলনীতি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। তা হলো, সংশ্লিষ্ট আমল এমনভাবে পরিপালন করতে হবে, যেন এ ধারণা না জন্মে যে, উক্ত আমলের সময় বা ফযীলত নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট স্থানের সাথে কিংবা নির্দিষ্ট পন্থা বা ধরনের সাথে সীমাবদ্ধ অথবা কোনো আমল মুস্তাহাব হওয়া সত্ত্বেও পরিপালনের পন্থা-প্রকৃতি থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, হয়ত আমলটি ফরয বা সুন্নাত (Al-Shāṭibī ND, 1/251)।

অতএব দু’টি শর্তে মুত্লাক্ব ইবাদতকে তাখসীস বা নির্দিষ্ট কিংবা সীমাবদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে।

ক. এ ধরনের তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণে শরী‘আতের উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করা যাবে না।

খ. তাখসীস বা নির্দিষ্ট করলে যেন এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, এ তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণ শরী‘আহর উদ্দেশ্য।

নিম্নোক্ত কারণে শর্তহীন (‘আম্ ও মুত্বলাক্ব) প্রকৃতির বিধানকে খাস বা নির্দিষ্ট এবং মুকাইয়্যাদ বা শর্তযুক্ত (খাস ও মুকাইয়্যাদ) করার বৈধতা নেই।

ক. মুত্লাক্ব (শর্তহীন ব্যাপক) ইবাদাতকে তাখসীস বা নির্দিষ্ট করলে শরী‘আহর দলীল-প্রমাণের ব্যাপকতা ও শর্তহীনতার লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়।

খ. এভাবে তাখসীস বা নির্দিষ্ট করলে সেসব যরী‘আহ বা উপলক্ষের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা শরী‘আত সিদ্ধ নয় এবং সেগুলো শরী‘আতসম্মত হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়।

গ. এরূপ তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণ পূর্ববর্তী সত্যের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তিন যুগের আদর্শ বা সুন্নাতের পরিপন্থি। অর্থৎ সাহাবায়ে কেরাম, তাবি‘ঈন ও তাবি-তাবি‘ঈন যে সকল ইবাদত পরিপালন ছেড়ে দিয়েছেন বা তাদের লিখিত গ্রন্থে আলোচনাও করেননি অথচ তা পরিপালন কিংবা কোনো মজলিসে আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ ও যথেষ্ট যুক্তি বিরাজমান ছিল এবং এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। তদুপরি তাঁরা এসবের কোনোটিই করেননি। এতে প্রতীয়মান হয়, এরূপ কাজ শরী‘আহসম্মত নয় বরং নব উদ্ভাবন ও বিদ‘আত।

ঘ. এরূপ তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণ পূর্ববর্তী সত্যের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তিন যুগের আমল ও রীতিনীতির পরিপন্থি। কেননা, তারা কখনো কোনো কোনো সুন্নাত পালন ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে কেউ তা ফরয জ্ঞান না করে বা তাদের আমলের গুরুত্বের কারণে তা ফরযে পরিণত না হয়।

চতুর্থ রূপ

শরী‘আহসম্মত বা শরী‘আহ-প্রবর্তিত আমলের সাথে অতিরিক্ত আমল এমনভাবে সংযোজন করা যেন অতিরিক্তটুকু শরী‘আহসম্মত বা শরী‘আহ-প্রবর্তিত আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় বা এমন বৈশিষ্ট্যের মত হয়, যাতে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, উক্ত আমলের সাথে অতিরিক্ত অংশটুকু জুড়ে দেয়াই নিয়ম। যেমন, কেউ কোনো প্রাণি জবেহ করার সময় কিংবা ক্রীতদাস মুক্ত করার সময় বলল, “হে আল্লাহ, এটা তোমার পক্ষ থেকে এবং তোমারই উদ্দেশ্যে” তাওয়াফরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা।

অর্থাৎ শরী‘আহসম্মত কোনো আমলের সাথে অভ্যাসগত বা সাধারণ শরী‘আহসম্মত কোনো কাজ পালন করা হলে প্রথম আমলটির সাথে দ্বিতীয় কাজটি সংযোজিত বলে ধারণা তৈরি হয়। এমন সংযোজন বিদ‘আতে পরিণত হয়।

সুতরাং কেউ যদি শরী‘আহ নির্দেশিত কোনো ইবাদত পরিপালন করার পাশাপাশি অন্য কোনো বৈধ আমলও অনিচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে সংযোজন করে, বা নতুন কিছু সংযোজন করার উদ্দেশ্যে সংযোজন না করে এবং এরূপ সংযোজন বিদ‘আতের দিকেও ধাবিত না করে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, দুর্ভিক্ষ বা কোনো ভয়-ভীতি উপলক্ষে সমবেত হয়ে একসাথে দুআ মুনাজাত করা বৈধ। কেননা এরূপ আমলের কারণে সংযোজন শার’ঈ রূপ পরিগ্রহ করে না বা মসজিদে ঘোষণা দিয়ে জামাতবদ্ধ হয়ে সুন্নাত কায়েম করার মতও হয় না। কাজেই এরূপ করা হলে তা বিদ‘আতে পরিণত হবে না (Al-Shāṭibī ND 2/22-23)।

অতএব, প্রথম উপ-মূলনীতি অনুযায়ী শরী‘আত প্রদত্ত সঠিক রূপরেখা ও শরী‘আত প্রদর্শিত পন্থা-পদ্ধতির বিপরীত আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

পঞ্চম রূপ

যে সকল জামাতবদ্ধ আমল সপ্তাহ, মাস ও বছর ঘুরে আসার সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি হয় এবং গুরুত্বের সাথে নিয়মিত পরিপালন করা হয়, অথচ এর কোনো শার‘ঈ ভিত্তি নেই, সে সকল সমাবেশ বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এরূপ জমায়েত হওয়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুম‘আহ, ঈদ ও হজ্জের জন্য জমায়েত হওয়ার অনুরূপ। অথচ এর কোনো শার‘ঈ ভিত্তি নেই। এটাই নব আবিষ্কৃত বিদ‘আত। যেমন, হজ্জের দিনগুলোতে বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে সফর করা এবং সেখানে জমায়েত হওয়া মাকরূহ ও বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। অথচ বায়তুল মাকদিস যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা মুস্তাহাব এবং তাতে সালাত আদায় করা ও ই‘তিকাফ করাও শরী‘আহসম্মত আমল। তথাপি হজ্জের দিনগুলোতে বায়তুল মাকদিস যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার দ্বারা একটি বিশেষ সময়কে নির্ধারণ করা হয়, অথচ শরী’আতে এরূপ সময় নির্দিষ্ট করে বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে সফর করার বিধান নেই। উপরন্তু এতে

মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। যেমন এ সফর হজ্জ সংশ্লিষ্ট কোনো আমল বা হজ্জের সময়ে এ উদ্দেশ্যে সফর করা ফযীলতপূর্ণ মনে করার আশঙ্কা রয়েছে। এরূপ বিদ‘আতের উপলক্ষ বিদ‘আতেরই অন্তর্ভুক্ত (Ibn Taimiyyah ND, 2/634, 642)।

অতএব, পূর্বোক্ত প্রথম উপ-মূলনীতি অনুযায়ী শরী‘আত প্রদত্ত সঠিক রূপরেখা ও শরী‘আত প্রদর্শিত পন্থা-পদ্ধতির বিপরীত আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শরী‘আত প্রদত্ত সঠিক রূপরেখা ও শরী‘আত প্রদর্শিত পন্থা-পদ্ধতির অনুরূপ আমল করতে ইমাম আশ-শাতিবীর গুরুত্বপূর্ণ নিদের্শনা।

ইমাম আশ-শাতিবী রাহ. বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো মুস্তাহাব শারীরিক ইবাদত গুরুত্বের সাথে পালন করে তার উচিৎ এরূপ মুস্তাহাব আমল নিয়মিত পালন না করা, যাতে অজ্ঞ লোকেরা এরূপ মুস্তাহাব আমলকে ওয়াজিব মনে না করে।” কেননা ওয়াজিবের বৈশিষ্ট্য হলো তা গুরুত্বের সাথে নিয়মিত পরিপালন করা বা সময়ের পুনঃপুন আবর্তনে পুনঃপুন পালন করা। অনুরূপভাবে মুস্তাহাবের বৈশিষ্ট্য হলো– তা গুরুত্বের সাথে আঁকড়ে না ধরা। কাজেই মুস্তাহাব আমল নিয়মিত আঁকড়ে ধরলে কেউ ওয়াজিবের বৈশিষ্ট্য দেখে ওয়াজিবই ধারণা করে নিতে পারে। এরপর কালের পরিক্রমায় এক সময় একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এরূপ মুস্তাহাব আমলকেই ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করে পরিপালন করবে। আর এতেই মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। (Al-Jīzānī 1998, 167)।

দ্বিতীয় উপ-মূলনীতি ঃ যখন শার‘ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ বা মুবাহ কোনো আমল এমনভাবে পরিপালন করা হয়, যেন আমলটি শরী’আহর পক্ষ থেকে কাঙ্ক্ষিত ও ফযীলতপূর্ণ হওয়ার ধারণা তৈরি হয়, তাহলে এরূপ প্রকৃতির আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, হারামের পর্যায়ভুক্ত না হলে মসজিদ কারুকার্য ও সাজসজ্জা করা; কেননা, অনেকে এ কাজটিকে মহান আল্লাহর ঘর সমুন্নত করার অন্তর্ভুক্ত আমল হিসেবে বিবেচনা করে। তেমনিভাবে দামি ঝাড়বাতি ঝুলানো, অনেকেই এ কাজে অর্থ ব্যয়কে আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করা গণ্য করে। অনুরূপভাবে ইমাম শাতিবী [মৃ.৭৯০ হি.] রাহ. তাঁর কিতাব *ই‘তিসামে* উল্লেখ করেছেন, কিছু লোক বাসরার জামে মসজিদের আঙ্গিনায় সালাত আদায়ের পর সিজদার স্থান থেকে হাতে মাটি নিয়ে কপালে মাটি মিশ্রিত হাত বুলিয়ে নিতেন। এরপর বাসরার জনৈক শাসক মসজিদের আঙ্গিনায় পাথর ঢালাই করে সম্পূর্ণ আঙ্গিনা পাথর দিয়ে ঢেকে দিতে নির্দেশ জারি করে বলেন, আমি শঙ্কিত যে, যে সকল নবীন এ আমলটি দেখে বড় হবে, কালের পরিক্রমায় তারা ভাববে, সালাত আদায়ের পর সিজদার স্থান থেকে মাটি নিয়ে ললাট মাসেহ করা সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল! উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত আমলটি বাসরার শাসক (سدالذرائع) সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির ভিত্তিতেই মূলোৎপাটন করেন (Al-Shāṭibī ND, 2/108)।

মোদ্দা কথা, মৌলিকভাবে ইসলামে যে কাজটি করার অনুমতি রয়েছে- হয়ত মুবাহ বা মাকরূহ তানযীহী, কিন্তু কাজটি এমন পদ্ধতিতে পরিপালন করা হয়- যেন শরী‘আহর পক্ষ থেকে ফযীলতপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত আমল হিসেবে ধারণা তৈরি হয়, তাহলে এরূপ আমল সাধারণভাবে বৈধতার অনুমতি থাকলেও পরিপালনের ধরণ ও পদ্ধতির কারণে বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম শিহাবুদ্দীন আবূ শামা রাহ. বলেন, “সুতরাং যদি কেউ এমন কাজ করে, যা শরী‘আহর পক্ষ থেকে কাঙ্ক্ষিত আমল বলে ধারণা তৈরি হয় অথচ শরী‘আতে উক্ত কাজটি কাঙ্ক্ষিত আমল নয়, তাহলে ঐলোক কাজটি করে দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করল এবং দীনের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টি করল, আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে নিজ মুখে বা পরোক্ষভাবে অসত্য কথা বলল! [আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ কাজ থেকে বিরত রাখুন।] (Abū Shāmah 1981,18)।

তৃতীয় উপ-মূলনীতিঃ উক্ত কাজটি আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা এবং নিষিদ্ধ আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন শরী‘আহ নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনকারী আলিম হবেন, তথা যখন বিশেষভাবে সমাজের অনুসরণীয় আলিমগণ গুণাহের কাজ পুণ্যের মত করে করবেন এবং তাদের দিক থেকে পরিলক্ষিত হবে যে, গুনাহের কাজ হওয়া সত্ত্বেও তারা এর প্রতি ঘৃণা বা সতর্কতা অবলম্বন করেন না, যদ্দরুন সাধারণ মুসলিমরা ধারণা করে বসেন, এ কাজটি গুনাহ নয় বরং দীনের অন্তর্ভুক্ত পুণ্য কাজ, তাহলে এরূপ কাজও বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ সাধারণ মুসলিমরা আলিমদের বাস্তব আমলকে তাদের বক্তব্যের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যদিও তারা তাদের বক্তব্যের বিপরীত আমল করে। একজন মুফতি যেভাবে তার বক্তব্য দিয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকেন তেমনিভাবে তার আমলও ফতোয়ার কাজ করে। কেননা সাধারণ মুসলিমরা যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, যদি কাজটি নিষিদ্ধ বা মাকরূহ হতো তাহলে অমুক আলিম কাজটি করতেন না, তিনি বর্জন করতেন। যেহেতু তিনি বর্জন না করে বরং পালন করেছেন, তাহলে বুঝা গেল কাজটি করা শরী‘আহসম্মত (Al-Shāṭibī ND, 2/99-101)।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মূলনীতির দু‘টি দিক রয়েছে। যখন পাপ কাজ এমনভাবে সম্পাদন করা হয়, যেন তা পাপ কাজ নয় বলে ধারণা তৈরি হয়, ক. হয়ত আলিমগণ উক্ত পাপ কাজ নিজেরাই সম্পাদন করবেন যেমন তৃতীয় শাখা মূলনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। খ. কিংবা আলিমগণ নিজেরা জড়িত না হলেও প্রতিবাদ না করে চুপচাপ বসে থাকবেন এবং পাপ কাজটিও প্রসারিত হতে থাকবে। (দ্র. নিম্নের চতুর্থ উপ-মূলনীতি)

ইমাম আশ্-শাতিবী রাহ বলেন, “এসবের মূল কারণ হলো, আলিমদের সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিহার করে নীরবতা পালন বা শারী‘আহর নিরিখে যাচাই না করে অসতর্কতার সাথে এসব আমল করে চলা। আর এ কারণেই আলিমদের পদস্খলনের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়। যেমন বলা হয়, তিনটি জিনিস দীনকে ধ্বংস করে দেয়- আলিমের পদস্খলন, কপট ব্যক্তির সাথে কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া ও

পথভ্রষ্ট নেতাদের নেতৃত্ব ও শাসন। প্রবাদ বাক্য আছে, একজন আলিমের পদস্খলন মানে গোটা পৃথিবীর পদস্খলন”(Al-Shāṭibī ND, 2/101)।

চতুর্থ উপ-মূলনীতি: উক্ত কাজটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং নিষিদ্ধ আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন শরী‘আহ নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপক প্রসার হবে এবং আলিমগণ প্রতিবাদ না করে চুপ থাকবে।

সাধারণ মুসলিমরা যখন পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়, অন্য দিকে সমাজের অনুসরণীয় আলিমগণ এর প্রতিবাদ করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চুপচাপ বসে থাকেন; যদ্দরুন সাধারণ মানুষ পাপ কাজ মনে না করে এটিকে বৈধ কাজ বলে ধারণা করে থাকে, তখন এরূপ কাজ এবং চুপচাপ বসে থাকা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত আমল। পক্ষান্তরে একজন আলিম যখন এরূপ পাপ কাজ সাধারণ মুসলিমরা করলেও এর প্রতিবাদ করবেন এবং পাপ কাজ বলে সচেতনতা সৃষ্টি করবেন তাহলে সাধারণ মুসলিমরা এরূপ পাপ কাজকে পাপ কাজ হিসেবেই জানবে এবং বিরত থাকবে। কারণ আলেমরা নবীদের ওয়ারিস, দাওয়াহর ক্ষেত্রে তাঁরা নবী রাসূলদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি।

ইমাম আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী রাহ. আরো বলেন, “সমাজের সাধারণ মুসলিমদের থেকে পাপাচার ও আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা পরিলক্ষিত হলে এবং তা ছড়িয়ে পড়লে, যাদের দায়িত্ব পাপাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা, গুনাহের কাজ চিহ্নিত করে সমাজের মানুষকে সতর্ক করা, আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতার পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা, এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের যথাসাধ্য দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চুপচাপ বসে থাকা বিদ‘আত, কারণ সাধারণ মানুষ তখন আলিমদের এরূপ নীরবতার সুযোগে পাপ কাজকেই বৈধ ধারণা করতে শুরু করবে। তারা যুক্তি পেশ করবে- যদি বৈধ না হতো অনুসরণীয় আলিমগণ তা নিষেধ করতেন, যেহেতু নিষেধ করছেন না, তাহলে বুঝা গেল, আমলটি অন্তত অবৈধ নয়। অনুরূপ যুক্তি পেশ করবে, যাতে তাদের জন্য কাজটি করা ন্যূনতম বৈধ হয়। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে শরী‘আহর বিরুদ্ধাচরণই বিদ‘আত হিসেবে পরিগণিত হবে”(Al-Shāṭibī ND, 2/102)।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাপকভাবে প্রসারিত প্রকাশ্য শরী‘আহ বিরোধী কর্মকাণ্ড, যেমন বর্তমানে নানান ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সুদী লেনদেন। বলা বাহুল্য, আলিমগণ এ জাতীয় ব্যাপকভাবে প্রসারিত প্রকাশ্য পাপাচারের বিরোধিতা না করলে এবং জনগণকে সতর্ক না করলে তারা এসব বৈধ বলে ধারণা করতে শুরু করবে। বলা বাহুল্য, বর্তমানে অনেক শরী‘আহ বিরোধী কাজকে সাধারণ মুসলিমরা আলিমদের নীরবতার কারণে বৈধ হিসেবে জ্ঞান করছে।

কাজেই এরূপ বিভ্রান্তির মূলোৎপাটনে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতি গ্রহণ করে পথ চলার মাঝেই কল্যাণ এবং অধিকতর সতর্কতা নিহিত।

উল্লেখ্য, ইমাম আশ-শাতিবী রাহ. আরো বলেন, “এসব আমল বিদ‘আতে পরিণত হবে যদি এগুলো মানুষের উপস্থিতিতে পরিপালন করা হয় এবং লোকদের পক্ষে পরিপালনকারীকে অনুসরণের সুযোগ থাকে। তবে যদি কেউ এসব আমল নিজে নিজে একাকী পরিপালন করে, লোকজনও অবগত না হতে পারে এবং এসবের ব্যাপারে শার‘ঈ বাস্তবতার বাইরে কোনো বিশ্বাস পোষণ না করে থাকে তাহলে বিদ‘আতে পরিণত হবে না”(Al-Shāṭibī ND, 3/333)।

বিদ‘আতের উপায়-উপকরণ বিদ‘আতের অর্ন্তভুক্ত

যে সব আমল এমন দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট যে, সন্দেহ করা হয়– এটি কি বিদ‘আত নাকি বিদ‘আত নয়? বিদ‘আত হলে নিষিদ্ধ হবে, পক্ষান্তরে বিদ‘আত না হলে তার ওপর আমল করা যাবে। এরূপ হলে বিদ‘আতে লিপ্ত হওয়ার উপলক্ষ হিসেবে এরূপ আমল ছেড়ে দেয়াই উত্তম ও এতেই অধিকতর সতর্কতা (Abū Shāma 1981, 65-66, Al-Shāṭibī ND, 2/6)।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ সারাখসী রাহ. বলেন,

> أن ما تردد فيه بين الواجب والبدعة يأتى به احتياطا لأنه لا وجه لترك الواجب وما تردد بين البدعة والسنة تركه لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة ليس بلازم
>
> যে বিষয়টি ওয়াজিব ও বিদ‘আত হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেবে, তা সতর্কতার খাতিরে পালন করতে হবে। কেননা ওয়াজিব ছেড়ে দেবার কোনো অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যে বিষয়টি বিদ‘আত ও সুন্নাত হবার ব্যাপারে সংশয় দেখা দেবে, তা ছেড়ে দিতে হবে। কেননা বিদ‘আত পরিত্যাগ করা আবশ্যক। অপরদিকে সুন্নাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

যে সকল ইবাদতমূলক বা অভ্যাসগত কাজ বিদ‘আত নির্ভর এবং যা বিদ‘আতের পরিণতিস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে তা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিদ‘আতের ওপর ভিত্তিশীল আমল বিদ‘আতরূপেই গণ্য হবে।

এ মূলনীতি বিদ‘আত সম্পাদন করার ফলে সৃষ্ট এবং বিদ‘আতের অনুবর্তীরূপে উদ্ভূত কর্মকাণ্ডের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা এ সকল কর্মকাণ্ড বিদ‘আতের উপলক্ষের অন্তর্ভুক্ত। শরী‘আত প্রণেতা যখন কোনো বিধান প্রণয়ন করেন তখন বিধানের সাথে তার অপরিহার্য ও পরিপূরকসমূহও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অপরিহার্য ও পরিপূরকসমূহ হয়ত উক্ত বিধানের জন্য প্রারম্ভিক পর্ব হিসেবে পরিগণিত হবে কিংবা বিধানের অনুবর্তীরূপে অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি বিধানের জন্য প্রারম্ভিক পর্ব হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে এগুলো হলো সেই মাধ্যম তথা আসবাব (أسباب) বা উপায়সমূহ এবং শর্তাবলি (شروط), যার ওপর বিধানের কার্যকারিতা নির্ভর করে। পক্ষান্তরে যদি বিধানের অনুবর্তীরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এগুলো বিধানের সেই তাওয়াবে‘ (توابع) বা অনুবর্তী ও পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত, যা বিধান থেকে অনুবর্তীরূপে শাখাস্বরূপ

উদ্ভূত। কাজেই বিদ‘আতের ক্ষেত্রেও এর তাওয়াবে‘ বা অনুবর্তী ও পরিপূরকসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিদ‘আত হিসেবে পরিগণিত হবে।

বিদ‘আত নির্মূলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতি প্রয়োগ না করার পরিণতি

প্রথমত: সাধারণ ব্যক্তিবর্গ ও যাদের নিকট ইসলামী শরী‘আহর জ্ঞান নেই, তাদের যে আমল ফরয নয় তা ফরয জ্ঞান করা, যা সুন্নাত নয় তা সুন্নাত জ্ঞান করা কিংবা যা শরী‘আহসম্মত নয় তা শারী‘আহসম্মত মনে করা একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি। কেননা শরী‘আতের বাস্তবতার বিপরীত কোনো কিছু বিশ্বাস পোষণ করা বা শরী‘আতের নির্দিষ্ট সীমারেখা ও পদ্ধতির বাইরে কোনো আমল প্রবর্তন করা শরী‘আতের সুস্পষ্ট বিকৃতি সাধন এবং বিধি-বিধানের সীমালঙ্ঘন।

দ্বিতীয়ত: সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ‘আত, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রচলন সহজ ও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। সাধারণত সুন্নাতের সাথে বিদ‘আতের মিশ্রণ এবং বৈধ ও অবৈধ কাজ একাকার হয়ে গেলে এ ধরনের বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়ত: সালাফে সালিহীনের রীতিনীতির অনুসরণ না করে পথ চলা। কেননা তাদের রীতিনীতি ছিল বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী হওয়ার আশঙ্কায় বৈধ কিংবা মুস্তাহাব কাজও ছেড়ে দেয়া। তারা এরূপ বৈধ বা মুস্তাহাব আমলও ছেড়ে দিতেন বা নিয়মিত পালন করা ছেড়ে দিতেন; যেন তা বিদ‘আতে পরিণত না হয় বা কেউ তাকে বিদ‘আতে পরিণত না করে।

গবেষণা ফলাফল

বিদ‘আতের উপায় ও মাধ্যমসমূহের চর্চা পরিহার করে দীনের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ (سدالذرائع)-এর প্রয়োগ সংক্রান্ত এ গবেষণা থেকে যে ফলাফল অর্জিত হয় তা নিম্নরূপ:

ক. যে সব উপায় ও মাধ্যম বিদ‘আতের দিকে ধাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে তাকে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির অধীনে রুদ্ধ করার মধ্যেই সতকর্তা ও দ্বীনের হিফাজত নিহিত রয়েছে।

খ. প্রত্যেক শার‘ঈ বিধানের মর্যাদাগত বিশেষ অবস্থান রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো, শরী‘আহর সকল বিধিবিধানকে স্তর ও মর্যাদগত দিক থেকে এক রকম করে না ফেলা- যেমন ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বা সুন্নাত সকল বিধানকে এক রকম না করা– মৌখিক বক্তব্যের দ্বারাও না, কাজের মাধ্যমেও না কিংবা বিশ্বাসের মাধ্যমেও না। প্রত্যেক বিধানের স্বতন্ত্র পর্যায় রয়েছে। প্রত্যেক বিধানকে তার পর্যায়ে রাখা আমাদের ওপর ওয়াজিব।

গ. কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়– এমন ব্যাপকার্থবোধক সাধারণ ওয়াজিব বিধানকে সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ করা বা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়াজিব বিধানকে উন্মুক্ত রাখা বৈধ নয়।

ঘ. মুস্তাহাব ও ওয়াজিব বিধানগুলো পরিপালনে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা, যেন দুটো পরস্পর সমান না হয়ে যায় বা গুরুত্বের বিচারে একই রকম না দেখা যায়। যেমন মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের মত গুরুত্ব না দেয়া, প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়া।

ঙ. মুস্তাহাব ও মুবাহকে সমান মর্যাদা না দেয়া। যেমন মুবাহ কাজের মত মুস্তাহাব কাজ সাধারণভাবে ছেড়েই দেয়া, কখনো পরিপালন না করা যদ্দরুন মুস্তাহাব কাজ মুবাহ কাজের মতো হয়ে পড়ে। আবার মাঝে মাঝে মুস্তাহাব কাজ পরিপালন করা, যেন তা মুবাহ কাজের মত মনে না হয়।

চ. মুবাহ ও মাকরূহ কাজ কিংবা মুস্তাহাব ও মাকরূহ কাজও একই রকমের না করা এবং উভয়কে সমান না করা। যেমন মুবাহ কাজ সম্পাদন করা যায় এবং মাকরূহ কাজ বর্জন করাই কাম্য, কিন্তু মুবাহ কাজকে মাকরূহ কাজের মত অপছন্দনীয় জ্ঞান করে একে বর্জন করা দুটোকে এক রকমের করে নেয়ার নামান্তর।

ছ. মাকরূহ ও হারাম কাজকেও এক করা যাবে না। মাকরূহ কাজ মাকরূহ পর্যায়ের অপছন্দনীয় কাজ, যা হারাম পর্যায়ের নয়। অর্থাৎ হারামকে অকাট্য হারাম জ্ঞান করা, তাকে মাকরূহের মত হালকা জ্ঞান না করা এবং মাকরূহকেও হারামের মত অকাট্য জ্ঞান না করা।

জ. আবার হারাম কাজ এবং হারাম নয় এমন যে কোনো কাজকে একই রকম জ্ঞান না করা। পরিপালনে হোক বা বিশ্বাসে– কোনোভাবেই সমান পর্যায়ে রাখা যাবে না।

ঝ. যেসব বিশ্বাস ও আমল সুন্নাত ও বিদ‘আত হবার ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা আলিমগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সে ক্ষেত্রে তা পরিত্যাগ করাই উচিৎ।

উপসংহার

সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী শরী‘আতে অনেক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহের অনেক বিধি-বিধান সাদ্দ্ আয-যারাঈ‘ মূলনীতি নির্ভর। ইমামগণ বিভিন্ন বিষয় নিষিদ্ধ হবার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে শরী‘আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। ইসলামী শরী‘আতে শিরকের উপায়-উপকরণ যেমনিভাবে শিরকের অন্তর্গত, ঠিক তেমনিভাবে বিদ‘আতের উপায়-উপকরণও বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। বিদ‘আতের উপায়-উপকরণ চিহ্নিত করতে, এর চর্চা রুদ্ধ করতে এবং দীনের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য। উপরন্তু, এ মূলনীতি অনুসরণ করা না হলে বিদ‘আত থেকে দীনের পূর্ণ হিফাজত সম্ভব নয়। বিদ‘আত থেকে দীনকে অবিকৃত ও হিফাজত করতে সাদ্দ্ আয্-যারাঈ‘ মূলনীতির যথার্থ প্রয়োগ অপরিহার্য।

Bibliography

Al-Qur ān Al-Karīm.

Abū Shāmah, Shihāb al-Din Abū Muḥammad 'Abd al-Rahmān ibn Ismā'iīl ibn Ibrāhīm 1981. *Al-Bā'es 'alā- Inkār al-Bid'a wa al-Hawādis*. Makka: wajārah al-'alām.

Abū Shāmah, Shihāb al-Din Abū Muḥammad 'Abd al-Rahmān ibn Ismā'il ibn Ibrāhim 2007. *Al-Bā'es alā- Inkar al-Bida wa al-Hawādith*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Majd al-Islām.

Abū-Dāūd, Sulaimān Ibn Ash'ath al-Sijistānī. ND. *al-Sunan.* Bairūt: Dār al-Risālah al-'alāmiyyah.

Al Bukhārī, Abū ‘Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā‘īl. 1422H. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī* . Edited by: Muḥammad Zahīr b. Nāṣir. Bairūt: Dār Ṭawq al Najāh

Al- Shawqānī, Muḥamad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. 2007. *Fatḥ al-Qadīr*. Annotated *by Yūsuf al-Ghush.* Bairūt: Dār al-M'arīfa.

Al-‘Anjī, Sulṭān Sa‘ūd ibn Malluh. 2007. *Sa'd al-dhara'I 'indal Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah*. 'Ammān: al-dār al-‘aṣriyyah.

Al-Bājī, Abū al-walid. 1996. *Al-Ishārah Fī-M'arifat al-usūl wa al-wijāzah fī-M'anā al-Dalīl.* Makka: Al-maktabah al- Makkiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muḥammd ibn Ismāʿīl. 2002. *Al- Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Bairūt: Dār Ibn Kathīr.

‘Alī, Aḥmad. 2011. *Bid’at*. Chattogram: Khaki Prokashoni

‘Alī, Aḥmad. 2019. *Tasawwufer Shorup*. Dhaka: Islamic Centre.

Al-Jīzānī,Muḥammad ibn Ḥusain.1998.*Qawā'id Ma'arifah al-Bid'a*. Riyadh:DārIbnAl-Jawzī.

Al-Qurṭubī, Muḥammad Ibn Waddāh. 1996. *Kitāb fīhi mā jāa fī al-Bid'ah Annotated by Badar ibn Abdullāh al-Badar.* Riyadh: Dār al-Samī'yee.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnātī. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl Al-Sharī'ah. Annotated by Abū Ubaiydah Mashhūr ibn Hasan Ālu Salmān*. Cairo: Dāru Ibnu Affān.

Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnātī. ND. *Al-'Itisām***.** Egypt: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al Raḥmān ibn Abī bakr ibn Muḥammad, 1983. *Al-Ashbāh wa al-naẓāyir*. Bairūt: Dār al-Kutubal-‘ilmiyah.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al Raḥmān ibn Abī bakr ibn Muḥammad, 1990. *Al-Amru bi al-Ittib'ā wa al-Naḥu an al ibtid'a,* annotated by Mashūr Ḥasan Salmān. Dammam: Dār Ibnul Qayyim.

Al-Turtūshī, Abū Bakar Muḥammad ibn al-Walīd 1990. Kītab al-Ḥawādith wa al-Bid’i. Dammam: Dār Ibn al-Jawzī.

Al-Youbī, Muḥammad Sa'ad Ibn Aḥmad ibn Masūd. 1998. *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'alāqatuha bi al-adillah al-Sharī'ah.* Riyāḍ: NP.

Al-Zuḥailī, Muaḥammad Muṣṭafā, ND. *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Makka: Majallah al-kulliayyah *al-Sharī'ah*wa al-dirāsāt al-Islāmiyyah Jāmiˈatu Ummul Qurā.

Amin, Ruhul, Muḥammad.2013. *Islami Ayner Utsoh*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research Centre.

Ba'labakī, Rūḥī. 1995. *Al-Mawrid A modern Arabic-English dictionary*. Bairūt: Dār Al 'Ilm lil malāiyyīn.

Fazlur Rahman, Muḥammad 2005. *Today's Arabic-Bengali, Dictionary ''al-Mujam al-Wafi'*. Dhaka: Riad Prokashoni.

Ibn al-Jawzī, 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī. ND. *Talbīs al-I'blīs*. Bairūt: Dār al-Kalām.

Ibn al-Qayyim, Shamsuddīn Abū 'Abdullāh Muḥammad al-Jawziyyah. 1423H. *I`lām al -Muwaqqiīn `an Rabbil `Ālamīn*. Riyāḍ: Dār Ibn Al-Jawzī.

Ibn 'Aṭiyyiah, Abū Muḥammad 'Abd Al Ḥaq Al-andalusī. ND, *Al-Muḥarrar al-wājīz fī tafsīr al-kitāb al-'azīz*. NP: Dār ibn Ḥajm

Ibn Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn khalf ibn 'Abdul Mālik 2003. *Sharḥu Shaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyāḍ:Maktaba alRushd.

Ibn Juzayy Al-Kalbī, Abūl Qāsim Aḥmad ibn Muḥammad. 1995. *Al-Taḥsīl li 'ulūm al-tanzīl*. Bairūt: Dār al-Kutub al 'ilmiyah.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisī.1969. *Al-Mughnī fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cairo: Maktabah al-kahirah.

Ibn Taimiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. ND. *Bayān al-Dalīl 'Alā Butlān al-Taḥlīl.* NP: Al-Maktaba al-Islami.

Ibn Taimiyyah, Taqī al Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. 1991. *Al-Istiqāmah annotated by Muḥammad Rashad Sālem.* NP: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad Ibn Sa'ūd

Ibn Taimiyyah, Taqī al Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. 1998. *Iqtidā al-Ṣirāt al-mustaqīm Annotated by Nāsir ibn 'Abd al-Karīm.* Riyādh:Maktaba al Rushd.

Khādimī, Abū Sayyīd Muḥammad , 2011. *Al-Barīqat al-Muhmmadiyyah fī sharḥi al-tarīqat al-Muḥammadiyyah*. Beirūt: Dār al-Kutubal-'ilmiyyah.

Monawer, Abū Talib Muḥammad 2017. "The theorization of Maqāsid al-Sharī'ah: A Historical Analysis." *Islami Ain o Bichar*. 13: 51 &52, 58.

Muslim, Abū al-Husain Muslim ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Naisābūrī.. 2006. *Al-Musnad al-Sahīh*. Riyāḍ: Dār Ṭaiba.

Qārī, 'Alī ibn Sultān Muḥammad 2001. *Mirqāt al -Mafātih Sharhu Misqāt al-Masābīh*. Bairūt: Dār al-Kutubal-ilmiyyah.